ইসলামি সংগঠনের বৈশিষ্ট্য

আব্দুল্লাহ খালিদ আদম

যারা ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের গুরুভার নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিয়েছেন, সেসব মহানুভব ও রব্বানী সেই কাফেলার নিদর্শন, বৈশিষ্ট্য ও আবশ্যকীয় গুণাবলী শায়খ আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। যাতে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ও কণ্টকাকীর্ণ পথ চিনতে কারো অসুবিধা না হয়।

শায়খ আযযাম রহিমাহুল্লাহ তাঁর 'আল ইসলাম ওয়া মুস্তাকবাল আল বাশারিয়্যাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য এমন কিছু দল থাকা অপরিহার্য, যেগুলো দাওয়াতের ও আকীদাহ বাস্তবায়নের পথে সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। এসব দলের জানা থাকতে হবে, যাদের নেতৃত্বে মানবতার মুক্তির সংগ্রাম পরিচালিত হয়, তাঁরা সাধারণ মানুষ হন না। দাওয়াত ও আকীদার পথে সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করতে শিখতে হয় তাঁদের। যেসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী তাঁদের মাঝে থাকা অপরিহার্য তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু হচ্ছে—

প্রথমত:

আল্লাহওয়ালা হতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে—

وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّـۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ

অর্থঃ 'তোমরা রব্বানী তথা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, এটা এই কারণে যে, তোমরাই মানুষদের (এই) কিতাব শেখাচ্ছিলে এবং তোমরা নিজেরাও (তথা) অধ্যয়ন করছিলে।' (সূরা আলে ইমরান, ০৩: ৭৯)

রব্বানী বলা হয় এমন আলেমকে, যিনি তদানুযায়ী আমল করেন। সাঈদ ইবনে জুবায়ের রব্বানী শব্দের তাফসীরে বলেন, "তাঁরা হচ্ছেন প্রজ্ঞাবান ও তাকওয়াবান ব্যক্তিবর্গ।" মোমিন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ইন্তেকাল করেন, সেদিন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া বলেন, 'এই উম্মাহর রব্বানী আজ ইন্তেকাল করেছেন।'

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُواْۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ

ٱلصَّٰبِرِينَ

অর্থঃ 'আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গে বহু 'রিব্বি' জিহাদ করেছে; আল্লাহর পথে-তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন।' (সূরা আলে ইমরান; ০৩: ১৪৬)

এ আয়াতেও রিব্বি হচ্ছেন, যারা রব্বানী। কারণ, তাঁরা আল্লাহর রবুবিয়্যাত বা প্রভুত্ব পুরোপুরি বুঝতে পেরেছেন, তাঁর ইবাদাত করেছেন এবং এ পথে ধৈর্য ধারণ করেছেন।

তাই আন্দোলন ও বিপ্লব, দাওয়াত, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী, ধৈর্যধারণ, ইলম ও আমল সবকিছুতেই একজন রব্বানী হতে হবে। অর্থাৎ এমন হতে হবে, একটা মুহূর্ত যেন এই বোধ জাগরুক না থাকা অবস্থায় পার না হয় যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান, তিনি সম্মানের উৎস, একমাত্র তিনিই যথেষ্ট, তিনি রক্ষাকর্তা, একমাত্র তিনিই হেফাজতকারী ও নিরাপত্তাদানকারী।

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنْ هَادٍ ٣٦

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامٍ ٣٧

অর্থঃ "আল্লাহ কি তাঁর বান্দার পক্ষে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে গোমরাহ করেন, তার কোনো পথপ্রদর্শক নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?" (সূরা যুমার; ৩৯: ৩৬-৩৭)

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿الأنعام: ١٧﴾

অর্থঃ 'আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। অপরদিকে তিনি যদি তোমার কোনো উপকার করেন (তাহলে তাতেও কেউ বাধা দিতে পারে না,) তিনি সব কিছুর ওপর একক ক্ষমতাবান।' (সূরা আল-আন'আম; ০৬: ১৭)

এটি অপরিহার্য বিষয় যে, দাওয়াত প্রদানকারী ব্যক্তি এই আয়াতের প্রতি নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে "আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান" এরপর জাহেলী সুশীল সমাজকে এই ঘোষণা শোনাবে-

قُلِ ٱدۡعُواْ شُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١٩٥

অর্থঃ 'বলে দাও, তোমরা ডাকো তোমাদের শরীকদের, অতঃপর আমার অমঙ্গল করো এবং আমাকে অবকাশ দিও না।' (সূরা আল আ'রাফ; ০৭: ১৯৫-১৯৬)

আল্লাহর কাছ থেকে সাহায্য-সহযোগিতা, মান-সম্মান ও আত্মিক দিক-নির্দেশনা নেওয়া ছাড়া মানুষের কোনো বিকল্প নেই। মানবতায় মুক্তির সংগ্রামে যে ব্যক্তি নিয়োজিত হতে চায়, তার জন্য এটা অপরিহার্য যে, অন্য সকল মানুষের তুলনায় আল্লাহর সঙ্গে তার সম্পর্ক অধিক *-দৃঢ় হবে। মানব সমাজকে পবিত্র করার চ্যালেঞ্জ যে ব্যক্তি গ্রহণ করতে চায়, তাকে সব মানুষের তুলনায় অধিক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হতে হবে। যে ব্যক্তি মানব সমাজকে উঁচু করতে চায়, তাকে অন্য সবার চেয়ে বেশী উঁচু ও মহৎ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত:

দাওয়াতের ক্ষেত্রে পার্থিব স্বার্থ, বৈষয়িক উপকারিতা এবং দ্রুত ফলাফলের আশা পরিত্যাগ করতে হবে।

কারণ, নবীগণ এ কথা বলতেন-

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿الشعراء: ١٤٥

অর্থঃ 'আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্ব-পালনকর্তাই দেবেন।'(সূরা শু'আরা; ২৬: ১৪৫)

সূরা আশ-শুআরাতে রাসূলদের (আলাইহিমুস সালাম) জবানিতে এই আয়াতের কথা বারবার এসেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বনু আমের ইবনে সা'সা' গোত্রের কাছে ইসলাম পেশ করলেন। তখন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য বুহাইরা ইবনে ফরাস জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা বলুন তো! আপনার এই বিষয় মেনে নিয়ে আমরা যদি আপনার কাছে বাইয়াত দেই, অতঃপর আপনার বিরোধীদের ওপর আল্লাহ যদি আপনাকে বিজয়ী করেন, তবে আপনার পর কি আমরা সেই কর্তৃত্ব লাভ করতে পারব?" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, "এই কুরসি তো আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করবেন।" এটা শুনে তখন তারা নবীজীকে প্রত্যাখ্যান করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে তাঁর রব এ কথা জানিয়েছেন-

فَإِمَّا نَذۡهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنۡهُم مُّنتَقِمُونَ ٤١

أَوۡ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِى وَعَدۡنَـٰهُمۡ فَإِنَّا عَلَيۡهِم مُّقۡتَدِرُونَ ٤٢

অর্থঃ 'অতঃপর আমি তোমাকে (দুনিয়া থেকে) উঠিয়ে নিয়ে গেলেও আমি এদের কাছে থেকে অবশ্যই (কিয়ামতের) প্রতিশোধ নেব। অথবা তোমার (জীবনদশায়) তোমাকে সে (শাস্তির) বিষয় দেখিয়ে দিব যার ওয়াদা আমি তাদের দিয়েছি (এই প্রতিশোধ কেউ ঠেকাতে পারবে না), আমি অবশ্যই তাদের ওপর প্রবল ক্ষমতায় ক্ষমতাবান।' (সূরা আয যুখরুফ; ৪৩: ৪১-৪২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালোভাবেই জানতেন, এই দ্বীন একদিন না একদিন অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। তিনি মুসলিমদের মধ্যে কাউকে জান্নাত ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিতেন না। অন্য কোনো বিষয়ের জন্য বাইয়াত নিতেন না। তাইতো আমরা দেখতে পাই, নির্যাতিত নিপীড়িত একটি পরিবারকে তিনি এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, "হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্য ধারণ করো। তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করছি।"

বাইয়াতে আকাবার দিন নবীজী ﷺ আনসারদের লক্ষ্য করে বলেন, "আমি এই মর্মে তোমাদের থেকে বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রী-সন্তানদেরকে যেভাবে নিরাপত্তা দাও, আমাকে ঠিক সেভাবে নিরাপত্তা দেবে।" তখন তাঁরা বললেন, 'আমরা এই অঙ্গীকার পূরণ করলে আমাদের জন্য কী রয়েছে হে আল্লাহর রাসূল?' তখন তিনি ইরশাদ করেন, "জান্নাত।"

অতএব, আল্লাহর সঙ্গে বাইয়াত ও চুক্তিবদ্ধ হতে হবে জান্নাতের ব্যাপারে। আর দুনিয়াতে বাইয়াত হতে হবে জান্নাতের জন্য কাজ করার ব্যাপারে।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴿التوبة: ١١١﴾

অর্থঃ 'নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন এই বিনিময়ে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।'(সূরা আত-তওবা; ০৯: ১১১)

তৃতীয়ত:

অলঙ্ঘনীয় মূলনীতি নির্ধারণ করতে হবে। নমুনা ও আদর্শ হিসেবে অল্প কিছু লোককে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা-দীক্ষা প্রদানের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে নয়। কারণ, মানুষ নমুনা, দৃষ্টান্ত ও আদর্শিক ব্যক্তিবর্গকে দেখে নিজেদের মাঝে পরিবর্তন আনে। তাই সংখ্যার চাইতে মানের ব্যাপারে আমাদের বেশি যত্নবান হওয়া উচিত। সত্যবাদী ধৈর্যশীল লোকেরা যদি সংখ্যায় অল্প হন, তবুও আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জয় লাভ করেন।

كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾

অর্থঃ "আল্লাহর সাহায্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র দলও বিশাল বাহিনীর ওপর জয়ী হয়েছে; আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন।" (সূরা আল-বাকারাহ; ০২: ২৪৯)

অলঙ্ঘনীয় এই মূলনীতি রিদ্দার ফিতনা চলাকালে গোটা আরব উপত্যকায় ইসলাম ফিরিয়ে এনেছিল। কারণ, সে সময়কার অনুসৃত ব্যক্তিদের মাঝে ছিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রিদ্দার সংবাদ জানতে পেয়ে বলেছিলেন, "তারা যদি একটি উট পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসূলুল্লাহ ?-কে দিত, তবে এর জন্য আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব। অথবা এই কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেবো। আমি জীবিত থাকতে দ্বীনের মাঝে শিথিলতা কথা হবে!"

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "তারা যদি একটি দড়ি পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে..." আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু উসামার বাহিনী ফ্রন্ট পাঠানোর ব্যাপারে জোর দেন। তখন যারা তাঁর কাছে বিলম্বের আবেদন করেন, তাঁদেরকে তিনি এই বলে জবাব দেন—

"ঐ সত্তার কসম যিনি ব্যতিত অন্য কোনো ইলাহ নেই! যদি কুকুরের দল রাসূলুল্লাহ ?-এর স্ত্রীদের পা কামড়ে ধরে, তবুও আমি ওই বাহিনীকে ফেরত আনব না, যা রাসূলুল্লাহ প্রেরণ করেছেন।" অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, "যদি আমার মনে হয়, হিংস্র পশু আমাকে ছো মেরে নিয়ে যাবে, তবুও আমি উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করব।"

রাসূলুল্লাহ ?-এর ইন্তেকালের পর উদ্ভূত সংকটপন্ন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা আবু বকরের মতো একজন দৃঢ় প্রত্যয়ী ব্যক্তিত্বকে সামনে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন অবস্থানের দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছায় পুরো উম্মাহকে ধ্বংস ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেসব আদর্শবান ব্যক্তির উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত, যারা অজ্ঞাত অবস্থা ও অপরিচিতির মাঝে প্রতিকূলতা মোকাবেলা করেন। যারা বন্ধু-শত্রু কারো কথায় আদর্শ বিকিয়ে দেবার কথা চিন্তাও করেন না।

সেসব অনন্যসাধারণ ব্যক্তির যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান অপরিহার্য, যারা জাহেলী সমাজের তাপে গলে যান না। সমাজের মাঝে দাওয়াতের কাজ করতে গেলে যে বৈরী পরিস্থিতি ও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়, সেগুলোর সামনে যারা নত হয়ে যান না। আমরা সে সমস্ত প্রত্যয়ীদৃপ্ত ব্যক্তিকে চাই, যারা জাহেলিয়াতের বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে উড়ে যান না।

ইরাক ও পারস্য বিজয়ের দিন মুসলিম বাহিনীর ভরা নদী পার হওয়ার ঘটনা ঐতিহাসিকদেরকে হতবাক করে দিয়েছে।^ এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। মুসলিমরা দজলা নদী পার হয়েছেন অথচ তাঁদের একজন সেনাসদস্য হাতছাড়া হয়নি। তার চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো: এই বাহিনী ততকালের সবচেয়ে বড় দুটি সভ্যতা রোম ও পারস্য বিরুদ্ধে লড়াই করেছে ও বিজয়ী হয়েছে, অথচ তাদেরকে নীতি-চরিত্র হারাতে হয়নি কিংবা নিজেদের দ্বীনের ক্ষেত্রে ছাড় দিতে হয় নি।

আল্লাহ তা'আলা কিসরাকে অপদস্থ করেছেন এবং তার সিংহাসন ধ্বংস করেছেন। কিসরা কেঁদে কেঁদে একথা বলত, 'হায়! আমার একহাজার পাচক ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এত অল্প সংখ্যক কর্মচারী নিয়ে আমি কীভাবে বেঁচে থাকব?' অপরদিকে পারস্যের মুসলিম আমীর সালমান আল ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতিদিন মাত্র এক দিরহাম খরচ করতেন!

চতুর্থত:

সত্যিকার ইলম ও খাঁটি আমলের মাধ্যমে দায়িত্বের আত্মগঠন। এটি একটি অপরিহার্য বিষয় যে, দায়ী ব্যক্তি নিজে অথবা তার শাইখের তত্ত্বধানে আত্মগঠনে মনোযোগী হবেন। এ লক্ষ্যে তাজবীদ সহকারে তিলাওয়াত এবং তাফসীর ও বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন সহকারে কুরআনে কারীমের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবেন। এমনিভাবে ই'তিকাফের মাধ্যমে মসজিদে সময় দিয়ে আত্মগঠনের কাজ করবেন। কারণ মসজিদে সকীনা অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রহমত নাযিল হয়। ফেরেশতাদের সম্মেলন ঘটে।

এমনিভাবে আল্লাহর পথের দিশা লাভ হয়, এমন উত্তম সান্নিধ্য গ্রহণ করা জরুরি। জী হা! ভাই! যাদের সংস্রবে আল্লাহর পথের দিশা লাভ হয়, যাদের কথায় আখিরাত স্মরণ হয়, খুব গুরুত্বের সঙ্গে তাদের সান্নিধ্য অর্জন করতে হবে। আর রাতের নামাযের কথা ভুলে গেলে কিছুতেই চলবে না। কারণ আত্মিক পরিশুদ্ধি ও স্বচ্ছতা অর্জনে এই আমলের গভীর অবদান রয়েছে।

রাতের নামাযের এই আমল সহ লোকদের অভ্যাস ছিল। এমনিভাবে নফল সিয়াম পালন করা, বিশেষভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবারের উক্ত আমল করা খুবই ফজিলতপূর্ণ।আঙ্গিককে জীবন্ত রাখার জন্য, শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা থেকে

অন্তরকে মুক্ত রাখার জন্য, বাজে ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির তাড়না থেকে অন্তরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সার্বক্ষণিক যিকিরের কোনো বিকল্প নেই।

এমনিভাবে গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি আমল হচ্ছে, সচ্ছলতার সময় শুকরিয়া আদায় এবং বিপদের সময় ধৈর্যধারণে অন্তরকে অভ্যস্ত করে তোলা। গুনাহ থেকে ইস্তেগফার, আকীদাহ ও আদর্শের পথে ত্যাগ স্বীকার, দুর্যোগ মোকাবেলা ও কষ্ট সহ্য করতে শেখা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমল।

প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে পড়াশোনার মধ্যে কিংবা ইবাদাত ও আমলের মধ্যে সময় কাটিয়ে সময়কে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করার কোনো বিকল্প নেই। অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তার মজলিস কিংবা বৃথাই রাত জেগে নিজেদের জীবনকে ধ্বংস করা আমাদের জন্য জায়েজ নয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত এবং পুণ্যবান পূর্বসূরীদের জীবনী পাঠ করে নিজেদের জন্য বিশুদ্ধ চিন্তা ধারা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণ করা।এসব কিছুর সঙ্গে দাওয়াত, মসজিদসমূহে মানুষকে দ্বীনি বিষয় শিক্ষাদান, সাহসিকতার সঙ্গে তাদের মাঝে দ্বীন প্রচার, সেই সঙ্গে আদব ও বুক সহকারে ইসলামি বৈঠকগুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া ইত্যাদি কাজগুলোতে নিজ অন্তরকে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। ইসলামি বিষয়ের পাশাপাশি সাইয়্যেদ কুতুব, মুহাম্মাদ কুতুব প্রমুখদের রচনাবলী পাঠ করতে হবে। আর এই সবকিছুই সহীহ নিয়্যাত ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে করা অপরিহার্য।

এ সমস্ত গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন, এগুলোকে ব্যক্তির মান-সম্মান বৃদ্ধির কারণ বানান এবং এগুলোর মাধ্যমেই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন।

وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحج: ٤٠﴾ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿الحج: ٤١﴾

অর্থঃ “আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর। তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। সব কাজেরই চূড়ান্ত পরিণতি একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলারই এখতিয়ারভুক্ত।” (সূরা আল-হাজ্জ; ২২: ৪০-৪১)

সাহায্য ও বিজয়

এটি এমন একটি বাস্তবতা যা সন্দেহাতীত। কোনো প্রকার সংশয় একে ঘিরে তৈরি হতে পারে না। কোনো প্রকার অস্পষ্টতা এ বিষয়ে থাকতে পারে না। আল্লাহকে যথাযথভাবে চিনতে পেরেছে; এমন কোনো তাওহীববাদী ব্যক্তির মনে এবিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ থাকতে পারে না যে, এই সাহায্য ও বিজয় অবশ্যই রূপ লাভ করবে। সাহায্য ও বিজয়ের এই বাস্তব রূপায়ন প্রত্যেক এমন ব্যক্তির জন্য, যিনি দা'ওয়াতের পথে রয়েছেন, যিনি রবের মানহাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ও আমানত পূরণের সংগ্রামে রয়েছেন।

সময় যতই পার হোক বিজয় অবশ্যই আসবে। জাহেলিয়াত যতই শক্তিশালী হোক, জাহেলী শক্তি যতই ষড়যন্ত্র করুক, দম্ভভরে চক্রান্তের যতই জাল বিস্তার করুক, যতভাবেই তারা চেষ্টা করুক, জঘন্য ও নিকৃষ্ট যত উপায়ই তারা অবলম্বন করুক, প্রচার প্রোপাগান্ডা ও বৈষয়িক শক্তি নিয়ে যতভাবেই তারা উপস্থিত হোক না কেন, মু'মিনদের পক্ষে বিজয় আসবেই। পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় এমনটিই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পুরো ব্যবস্থাকে তিনি এভাবেই সাজিয়েছেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ?-কে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দান করেছেন। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে যখন মক্কার পাহাড়-পর্বত ছেয়ে গেছে, মক্কায় রাসূলুল্লাহর দাওয়াত যখন বাহ্যিক বিচারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলশূন্য হলো, কুরাইশের বড় বড় অপরাধীরা যখন সীমালংঘন করল, জাহেলিয়াতের ধ্বজাধারীরা যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব মোস্তফা ?-কে সান্ত্বনা ও সুসংবাদ জানিয়ে ইরশাদ করেন-

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿يوسف: ١١٠﴾

অর্থঃ 'এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেত, তারা মনে করত, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাজির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু (আযাব থেকে) নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না।' (সূরা ইউসুফ; ১২: ১১০)

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "(এখানে যাদের কথা বলা হয়েছে) তাঁরা হলেন নবীদের অনুসারীগণ। নবীদের প্রতি তাঁরা ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁদেরকে সত্যায়ন করেছিলেন। ফলে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁরা বিপদের সম্মুখীন থাকেন, সাহায্য বিলম্বিত থাকে। শেষ পর্যন্ত রাসূলগণ যখন তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন এবং তাদের এই ধারণা জন্মে গেল যে, তাঁদের সম্প্রদায় তাঁদেরকে অস্বীকার করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, তখন রাসূলদের কাছে আল্লাহর সাহায্য আসে।"

উপরোক্ত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার পর খুব বেশি সময় অতিবাহিত হয়নি; এর ভেতরেই আনসারদের কাফেলা

মক্কায় প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মূলতঃ সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে প্রেরণ করেন। তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাহায্য-সহযোগিতার বাইয়াতে আবদ্ধ হন। আর এটাই ছিল প্রথম বাইয়াতে আকাবা। আর এরপর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা। এরপর মক্কা মুকাররমা থেকে পবিত্র শহর মদীনা-মুনাওয়ারায় প্রথম মুজাহির কাফেলা হিজরত করে। হিজরতের সোনালী এই সূত্রে সর্বশেষ যুক্ত হয়ে একে পূর্ণাঙ্গতা দান করেন মুহাম্মাদ ﷺ। আরহামুর রাহিমীন মহান প্রভুর অনুমতি পেয়ে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ভূখণ্ড ছেড়ে ইসলামী জগতের প্রাণকেন্দ্র, পুণ্যময় পবিত্র ভূমি মদীনায় হিজরত করেন। এতে করে বরকত ঘেরা এই ভূমিতে মানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নেতৃত্বে প্রথম ইসলামী সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। কুরআনের অনুশাসনে পরিচালিত এই সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা লাভের পর কুরাইশের জাহেলী সামরিক শিবিরের সাথে তাওহীদবাদী শিবিরের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

নিশ্চয়ই! মদীনার পবিত্র ভূমিতে কুরআনের অনুশাসনে পরিচালিত যে সমাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর হাত ধরে গঠিত হয়েছিল তা এমনি এমনি অস্তিত্বে আসেনি। বরং তা ছিল এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত। তা ছিল বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার ফসল।

প্রথম যুগের ধৈর্যশীল সাহাবীদের অবস্থা, তাঁদের বেদনাদায়ক উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে ইসলামী বিপ্লবের ধারা এবং জাহেলিয়াতের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিটি মু'মিন দলের অগ্রযাত্রার সঠিক কর্মপন্থা আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। মানবসমাজের ভ্রান্ত চিন্তাধারা জাহেলিয়াতের যে সমস্ত মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত, সেগুলোর বিলোপ সাধনকারী দলের পথচলার রূপরেখা আমাদের সামনে ভেসে ওঠে। মু'মিনরা একথা বুঝতে পারেন, সাহায্য ও বিজয়ের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষা, বিপদ ও কষ্ট স্বীকার করা, সাথীদের রক্তমাখা লাশের স্তূপের ওপর দিয়ে জিহাদের খুন রাঙ্গা পথ পাড়ি দেয়া একান্ত অপরিহার্য।

সাইয়্যেদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ তাঁর রচিত 'জিলালিল কুরআন' গ্রন্থে বলেন, “দাওয়াতের পথে এটি আল্লাহর সুন্নাহ যে, এখানে বিপদ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। এ পথে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দুর্যোগ মোকাবেলা করতে হবে। চরম বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হবে। অতঃপর সাহায্যের যত বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে ঘিরে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দোলা খেতে থাকে, যাবতীয় উপায় ও মাধ্যম থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে। তখন যাদের মুক্তি লাভের যোগ্যতা রয়েছে, তাঁরা মুক্তি লাভ করেন। তাঁরা অবিশ্বাসীদের ওপর আপতিত হতে চলা ধ্বংসযজ্ঞ থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। পরাক্রমের অধিকারী গোষ্ঠী যেই ধ্বংসযজ্ঞ ও বিধ্বংসী কর্মকাণ্ড চালায় তা থেকে যোগ্য ব্যক্তিরা বেঁচে যান। আর অপরাধীদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে। আল্লাহর ভয়ঙ্কর শাস্তি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। তারা দাঁড়াবার সুযোগটাও পায় না। অপর কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী তাদেরকে এই আযাব থেকে বাঁচাতে পারে না।

এসবের তাৎপর্য হলো, বিজয় যেন মূল্যহীন এমন কোনো বিষয়ে পরিণত না হয়, যার দরুন বিপ্লবী দাওয়াত একটি তামাশা

হয়ে দাঁড়াবে। সাহায্য যদি এতটাই সস্তা হতো, তাহলে প্রতিদিন নতুন নতুন লোক, নতুন নতুন মতবাদ নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত। এর জন্য কোনো কষ্ট স্বীকার করতে হতো না। অথবা হলেও খুবই কম ত্যাগ স্বীকার করতে হতো। আর দ্বীনে হকের দাওয়াত ঠাট্টা মশকরা ও তামাশার বিষয় হওয়াটা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। কারণ, এই দাওয়াত তো মানব গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা প্রণালী ও মানহাজ। তাই অনধিকার চর্চাকারীদের কুকর্ম থেকে একে রক্ষা করা অপরিহার্য।"

সাহায্য ও বিজয়: আল্লাহর সুন্নাহ

আল্লাহর সুন্নাহ হলো- সর্বদাই আল্লাহর সাহায্য, সহায় সম্বলহীন অল্পসংখ্যক মু'মিন বান্দার ওপর অবতীর্ণ হয়। এই মানুষগুলো সর্বময় শক্তির অধিকারী, সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহর সঙ্গে এমন মজবুত সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ, যা কখনোই ভেঙে যাবার নয়। এই মানুষগুলো শান-শওকত ও প্রাচুর্যের অধিকারী জাহেলী শক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। তাঁরা নিজেদের আদর্শের ওপর অটল, শত প্রতিকূলতা ও বৈরী পরিবেশের মাঝেও অবিচলতার মূর্তপ্রতীক। তাই জাহেলিয়াত যখন তার সর্বশক্তি নিয়ে সীমিত সম্বল্যের, বিপ্লবী, দ্বীনের ব্যাপারে আপোষহীন, মুষ্টিমেয় মু'মিন বান্দাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ঐশী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এই জামাত যখন জাহেলিয়াত ও তার ধ্বজাধারীদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় লিপ্ত হয়, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যখন তাঁরা নিরাশ হওয়ার একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যায়, ঠিক সে সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যের অব্যাহত ধারা প্রবাহ আরম্ভ হয়ে যায়। বিজয়ের সুরেলা আজানে ঘোর অমানিশা কেটে যাওয়ার ঘোষণা শোনা যায়। অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রভাতের আলোয় ধীরেধীরে চারিদিক উদ্ভাসিত হতে শুরু করে। বিজয়ের সুরেলা আজানে ঘোর অমানিশা কেটে যাওয়ার ঘোষণা শোনা যায়। অথচ একসময় এই ঘোর অমানিশায় চারিদিক ছেয়ে ছিল। রাসূলদের অনুসারীরা এবং আল্লাহ প্রদত্ত আমানত ও দায়িত্ব পালনকারীরা একসময় নানান শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿يوسف: ١١٠﴾

অর্থঃ 'এমনকি নবীরা (কখনো কখনো) নিরাশ হয়ে যেত, তারা মনে করত, তাদের (বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হবে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাজির হলো, (তখন) আমি যাকে চাইলাম তাকেই শুধু (আযাব থেকে) নাজাত দিলাম; আর না-ফরমান জাতির ওপর থেকে আমার আযাব কখনোই রোধ হবে না।' (সূরা ইউসুফ; ১২: ১১০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিতাবুল কারীমের বিভিন্ন জায়গায় দাওয়াতের গুরুভার বহনকারীদের সাহায্যের ব্যাপারে

তাঁর নিজস্ব সাধারণ রীতি ও সুন্নাহর বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, সাহায্য লাভ করাটা সীমিত সহায় সম্বল্যের অধিকারী মুষ্টিমেয় ধৈর্যশীলদের পথের সঙ্গী। তাইতো পূর্ববর্তী উম্মতের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ قَالَ هَلْ
عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖ قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖ فَلَمَّا
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ٢٤٦﴾ وَقَالَلَ هُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ
طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٤٧﴾ وَقَالَ لَهُمْ
ۚ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿البقرة: ٢٤٨﴾ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن
شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ
رِينَ ﴿البقرة: ٢٤٩﴾ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّ
صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿البقرة: ٢٥٠﴾

فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿البقرة: ٢٥١﴾

অর্থঃ "মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াই-এর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়াল (লড়াই থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল)। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। আর তাদের কাছে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের ওপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশি। আর সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরও বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের

পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাকো, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করল না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। আর যখন তালূত ও তার সেনাবাহিনী শত্রুর সম্মুখীন হলো, তখন বলল, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের মনে ধৈর্য সৃষ্টি করে দাও এবং আমাদেরকেও দৃঢ়পদ রাখো-আর আমাদের সাহায্য করো সে কাফের জাতির বিরুদ্ধে। তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিলো এবং দাউদ, জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে দান করলেন রাজ্য ও অভিজ্ঞতা। আর তাকে যা চাইলেন শেখালেন। আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।" (সূরা আল-বাকারাহ; ০২: ২৪৬—২৫১)

তাদের হাজার হাজার লোক বের হয়েছিল। কিন্তু সাহায্য কাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে? নিশ্চয়ই তা অবতীর্ণ হয়েছিল সীমিত প্রস্তুতি ও সম্বল্যের অধিকারী অল্পসংখ্যক মু'মিন বান্দাদের ওপর। তাঁরা ছিলেন অটল-অবিচল, ধৈর্যশীল। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, বদরের মুজাহিদদের চেয়ে তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিল না। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেয়া, ভালো থেকে মন্দ পার্থক্য হওয়া, উপযুক্ত অন্তরগুলো পরিশুদ্ধ হওয়া, কপটতা ও মনের গোপন বিষয় প্রকাশিত হওয়া, অবস্থার প্রচণ্ডতা সহ্য করতে না পেরে অনেকেরই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করা, ভূমি সংকীর্ণ হয়ে আসা, যাত্রা দীর্ঘায়িত হওয়া, যাত্রাপথে সংখ্যা স্বল্পতার দুর্ভোগ পোহানো এবং জমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার কাজে প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের জন্য রাব্বে কারীমের পক্ষ থেকে অনিবার্য পরীক্ষায় অনেকেই অকৃতকার্য হওয়া... এতকিছুর পর তাঁরা বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনতে পেরেছিলেন।

'আল বাহরুল মুহীত' নামক তাফসীর গ্রন্থের লেখক বলেন, "আধিক্য বিজয়ের কারণ নয়। কারণ, অনেক সময় এমন দেখা গেছে যে, অল্প সংখ্যক লোক সংখ্যায় অধিক যারা তাদের ওপর বিজয় লাভ করেছে।"

মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পুণ্যবান সাহাবাদের ওপর সাহায্য তখনই অবতীর্ণ হয়েছে, যখন তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন নগণ্য এবং

তাঁদের সহায় সম্বল ছিল সীমিত। আমাদের সামনে জীবন্ত হয়ে রয়েছে বদরের ঘটনা। বিশেষ তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অমান্য করার আগ পর্যন্ত উহুদের ঘটনাও বদরের অনুরূপ। খন্দকের যুদ্ধের সময় গোটা জাহেলী শক্তিকে সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ তা'আলা নিজ কুদরতের মাধ্যমে বহুধা বিভক্ত করে দেন। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিমদেরকে সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ধোঁকায় ফেলে দিয়েছিল। এমনকি অনেকেই এমনটা বলে ফেলেছিলেন, 'আজ অন্তত সংখ্যা স্বল্পতার দরুন আমরা পরাজিত হব না।' অতঃপর নিজেদের সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পর অন্তরের বস্তুবাদী নির্ভরতা ও আল্লাহর শক্তি-সাহায্যের কথা ভুলে যাওয়ার ওই মুহূর্তে তারা সাময়িক পরাজয় বরণ করেন। তখন কোনো সাহায্য অবতীর্ণ হয়নি। মুহাম্মাদ ﷺ-এর সঙ্গে অল্প কিছু সাহাবী যারা সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি দ্বারা প্রতারিত হন নি—তারা ব্যতীত বাহিনীর অন্য সবার মাঝে যখন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। তখন মুসলিমরা আল্লাহর সাহায্য পাননি।

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ ۙ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿التوبة: ٢٥﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿التوبة: ٢٦﴾

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্য সেদিন সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটিই হলো কাফেরদের কর্মফল'। (সূরা আত-তাওবাহ; ০৯: ২৫-২৬)

সাহায্য ও বিজয় দানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার এই সুন্নাহ নিয়ে চিন্তা করা উচিত। এই বিষয়টি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। বাতিলের সংখ্যাধিক্য, তাদের বিরাট বিরাট বহর দেখে প্রতারিত হওয়া উচিত না। নিশ্চিত থাকা উচিত, সাহায্য ও বিজয় জড়িয়ে আছে ধৈর্য ধারণের সঙ্গে। কখনোই একটি প্রতিকূল অবস্থা দু'টি স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থাকে পরাভূত করতে পারে না। কারণ সংখ্যাধিক্য— ইমাম রাযী যেমনটা বলেছেন—কখনোই মূল বিষয় নয়, বরং মূল বিষয় হলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমানী সাহায্য। যদি ক্ষমতা হস্তগত হয়েই যায়, তবে শুরুর দিকে সংখ্যা স্বল্পতা ও লাঞ্ছনায় কি আসে যায়! আর যদি পরাজিতই হতে হয়, তবে সংখ্যাধিক্য ও পর্যাপ্ত প্রস্তুতি দিয়ে কী লাভ!

বিজয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মর্মঃ

তাওহীদের পথের পথিকদের একটি বিষয় খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। আর তা হচ্ছে বিজয়ের মর্ম। নিঃসন্দেহে বিজয়ের সেই মূল মর্মটি হচ্ছে, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এত ত্যাগ-তিতিক্ষা, যার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন, যে উদ্দেশ্যের জন্য রক্ত ঝরানো, লাশের স্তূপ তৈরি, মতবাদ ও আদর্শ জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে সে লক্ষ্যের বাস্তবায়ন।

আকীদাহ ও আদর্শকে জয় করার এই লক্ষ্যের ওপরই প্রথম যুগের সাহাবায়ে কেরাম মানব সমাজের ইমাম মুহাম্মাদ ﷺ-কে বাইয়াত দিয়েছিলেন এবং মোবারক ওই কাফেলা আল্লাহর পথে মৃত্যুন্মুখে হেঁটেছিল। পার্থিব ও বৈষয়িক কোনো বিষয়ে তাদের দৃষ্টি ছিল না। তাদের আশা ও চিন্তার বিষয় শুধু এটাই ছিল যে, কীভাবে এই আকীদাহকে জয় করা যায়? কীভাবে এই আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়? অনুসারীদের মনে কীভাবে আদর্শের রাজ কায়েম করা যায়? এর বাইরে রাজ্য দখলের কোনো লালসা তাদের ছিল না। কোনো সিংহাসন অথবা রাজদণ্ড করায়ত্ত করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল আরহামুর রাহিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে চিরস্থায়ী আবাস জান্নাত লাভ করা।

উস্তাদ আবুল হাসান নদভী এই বাস্তবতাকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

"এমনকি যখন তাঁরা নিজেদের অন্তরকে শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্ত করলেন, তাঁরা যখন দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করলেন, অন্যের কাছ থেকে প্রাপ্য বুঝে নেয়ার মতোই তাঁরা যখন তাঁদের কাছে থাকা অন্যদের প্রাপ্য নিজেদের থেকে বের করে নিয়ে পৃথক করে ফেললেন, দুনিয়াতেই যখন তাঁরা আখিরাতের মানুষে পরিণত হলেন, বর্তমানের কোলেই যখন তাঁরা ভবিষ্যতের মহামানব হয়ে গেলেন, বিপদ-আপদ যখন তাঁদেরকে বিমর্ষ করে ফেলত না, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যখন তাঁদেরকে উল্লসিত করত না, দারিদ্র্য যখন তাঁদেরকে অস্থির করে তুলত না, আবার আর্থিক স্বচ্ছলতা যখন তাঁদেরকে সীমালংঘনে প্ররোচিত করত না, ব্যবসা-বাণিজ্য যখন তাঁদেরকে উদাসীনতায় লিপ্ত করত না, শক্তির প্রাবল্য যখন তাঁদেরকে নিরুদ্যম করত না, জমিনে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার প্রধান লক্ষ্য যখন তাঁরা লালায়িত ছিলেন না, অনর্থ সৃষ্টি করতে উদ্যত ছিলেন না, মানব সমাজের জন্য যখন তাঁরা ন্যায়-নিষ্ঠার মানদণ্ড হয়ে গেলেন, নিজেদের পিতা-মাতার কিংবা আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে যখন তাঁরা আল্লাহর সাক্ষী হয়ে গেলেন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় যখন তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে এই পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করলেন। তাঁরা নির্যাতিত মানবতাকে মুক্ত করলেন। বিশ্বকে রক্ষা করলেন। আল্লাহর দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করলেন।"

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবুল কারীমে সে লোকদের কিছু ঘটনা আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন, যারা আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত লাভ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা অতি হৃদয়গ্রাহী শৈলীতে অপরূপ উপস্থাপনায় আসহাবুল উখদুদের ঘটনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন যে, সেখানে মু'মিনদের আকীদাহ কীভাবে বিজয়ী হয়ে গৌরব, সম্মান ও অমরত্ব অর্জন

করেছিল। তাঁরা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছিলেন এমনকি নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের রক্ত দিয়ে তাওহীদকে সিঞ্চিত করেছিলেন। তাঁদের আশা ছিল দয়াময় আল্লাহর নেয়ামতের ভাণ্ডার ঘিরে। আরহামুর রাহিমীন আল্লাহর দরবারে তাঁরা সম্মানিত মেহমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। এর জন্য তাঁদেরকে বৈষয়িক স্বার্থ তুচ্ছ করতে হয়েছিল। সীমালংঘনকারী জাহেলী শক্তির অগ্নিগর্ভ গর্তে নিজেদেরকে নিক্ষিপ্ত করতে হয়েছিল। এভাবেই মূল্যহীন জাগতিক স্বার্থের ওপর তাঁরা আকীদাহকে স্থান দিয়েছিলেন। দেহবাদী জড় জগতে নয়, বরং আত্মার জগতে তাঁরা বিজয়ের মুকুট লাভ করেছিলেন। প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তাঁরা যুগ যুগান্তরের সকল আদর্শবান ব্যক্তির জন্য পথিকৃৎ হয়ে রইলেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴿البروج: ١﴾ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ﴿البروج: ٢﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿البروج: ٣﴾ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴿البروج: ٤﴾ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿البروج: ٥﴾

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿البروج: ٦﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿البروج: ٧﴾ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿البروج: ٨﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿البروج: ٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿البروج: ١٠﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿البروج: ١١﴾

অর্থঃ "শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের, এবং (শপথ) সে দিনের যার আগমনের ওয়াদা করা হয়েছে, শপথ (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষীর, (শপথ সেই ভয়াবহ দৃশ্যের) এবং যা কিছু (তখন) পরিদৃষ্ট হয়েছে তার; গর্তের মালিকদের ওপর অভিসম্পাত, আগুনের কুণ্ডলী – যা জ্বালানি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, (অভিসম্পাত) যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল। তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু। যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় ঝর্ণাধারা সমূহ। এটাই মহাসফল্য।" (সূরা বুরুজ; ৮৫: ১-১১)

পবিত্র আত্মাগুলো রবের কাছে চলে গিয়েছিল। আকীদাহ ও আদর্শের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রবের সন্তুষ্টি অর্জন করে তাঁরা এ দুনিয়া ছেড়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বহু নেয়ামতের একক মালিকানা তাঁদেরকে দান করেছেন। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ উক্ত আয়াতগুলোর অত্যন্ত চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি 'মা'আলিম ফিত্তারীক – (ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা)' নামক অমর গ্রন্থে অগ্নিগর্ভে নিক্ষিপ্ত মু'মিনদের শুভ পরিণাম সম্পর্কে বলেন,

"আল্লাহর মানদণ্ডে একমাত্র ঈমানের ওজনই ভারী। আল্লাহর বাজারে শুধু ঈমানের পণ্যেরই চাহিদা রয়েছে। বিজয়ের উৎকৃষ্ট

নমুনা হচ্ছে বস্তুর ওপর ঈমানের প্রাধান্য। উল্লেখিত ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ঈমানদারদের রূহ, ভয়-ভীতি, দুঃখ কষ্ট এবং পার্থিব জীবনের আরাম-আয়েশ ও ভোগলিপ্সার ওপর পরিপূর্ণরূপে বিজয়ী হয়। চরম নির্যাতনের মুখে ঈমানদারগণ যে বিজয় ও সম্ভ্রম অর্জন করে গিয়েছেন, তা মানব জাতির ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করে। আর এ বিজয়ই হচ্ছে সত্যিকারের বিজয়। সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু মৃত্যুর উপলক্ষ হয় বিভিন্ন ধরনের। উল্লেখিত ঈমানদার ব্যক্তিদের মতো সাফল্য সকলের ভাগ্যে জোটে না। এমন উচ্চ পর্যায়ের ঈমান অর্জন করাও অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। এ ধরণের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সকলে ভোগ করতে পারে না এবং তাদের মতো উচ্চস্তরে বিচরণ করার সৌভাগ্যও সকলের হয় না। আল্লাহ তা'আলাই তাঁর অপার অনুগ্রহে একদল লোককে বাছাই করে নেন, যারা সকল মানুষের মত মৃত্যুবরণ করে। কিন্তু তাদের উপলক্ষ হয় অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক। এ সৌভাগ্য অন্য কেউ অর্জন করতে পারে না। তারা মহান ফেরেশতাদের চেয়েও উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান লাভ করে থাকে। সম্মান ও মর্যাদার উল্লেখিত নিরিখে তারা মানবজাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার অধিকারী হয়ে যান।...উল্লেখিত মু'মিনদের ঈমান পরিত্যাগ করে জীবন বাঁচানোর সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এরূপ করার ফলে তারা নিজেরা এবং সমগ্র মানব গোষ্ঠী কেমন ক্ষতিগ্রস্ত হতো? 'ঈমান বিহীন জীবনের এক কানাকড়ি মূল্যও নেই'—এ মহান সত্যকে যদি জীবন রক্ষার খাতিরে বর্জন করে দেয়া হতো, তাহলে মানবজাতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আকীদা-বিশ্বাসের স্বাধীনতা হারানোর পর মানুষ নিস্তেজ হয়ে যায়। জালিম শাসকগোষ্ঠী যদি দেহের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আত্মার ওপরও শাসন করতে সক্ষম হয়, তাহলে মানবসভ্যতা চরমভাবে অধঃপতিত হয়। উল্লেখিত ঈমানদারগণ ঈমানের যে পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তার ফলে তাদের জীবন্ত দেহে আগুনের দাহিকা শক্তি কার্যকর হবার সময়ও তারা মহাসভ্যতা ও পবিত্রতার ওপর অটল ছিলেন। তাদের নশ্বর দেহ যে সময়ে আগুনে জ্বলছিল, সে সময় তাদের মহান ও সুউচ্চ আদর্শ সফলতার সোপান বেয়ে ঊর্ধ্বে আরোহণ করছিল। বরং আগুন তাদের আদর্শ পরায়ণতাকে আরও ঔজ্জ্বল্য দান করেছিল।"

সত্যের অনুসারীদের স্মৃতিপটে যেন এই চিত্র পাকাপাকিভাবে বসে যায়, প্রতিটি তাওহীদবাদী ব্যক্তি এ বিষয়টি যেন ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, প্রকৃত বিজয় হচ্ছে, আকীদাহ বিজয়ী হওয়া এবং মতবাদ ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করা। আমরা আমাদের বর্তমান সময়ে উল্লেখিত নিরিখে বিজয়ী একজন আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরব। তিনি হলেন ভবিষ্যতের বহু প্রজন্মের মহান শিক্ষক সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ রহিমাহুল্লাহ। যখন বহু রথী-মহারথী পাপিষ্ঠ, নির্লজ্জ তাগুত গোষ্ঠীর পায়ের সামনে নত ছিল, তুচ্ছ দুনিয়াবী স্বার্থের জন্য তাদের দরবারে ভিক্ষার হাত পাতা ছিল, অন্যেদের দুনিয়ার বিনিময়ে তারা নিজেদের দ্বীনকে নগণ্য মূল্যে বিক্রি করছিল, তখন আপোষহীন সাইয়্যেদ কুতুব আদর্শের ব্যাপারে সরব হয়েছিলেন। দীপ্ত কণ্ঠে নিজ আকীদা ও দ্বীনের ঘোষণা বিশ্ববাসীকে শুনিয়েছিলেন। দুনিয়ার যাবতীয় স্বার্থ তিনি জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন। দুনিয়া যখন অতিষ্ঠ অপদস্থ হয়ে তাঁর কাছে ধরা দিয়েছিল, তুচ্ছ হয়ে যখন তাঁর কাছে হাজির হয়েছিল, তখন তিনি সেগুলোকে পা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিলেন। কোনো দিকে না ভ্রূক্ষেপ না করে আপন রবের বাণী প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। নবী-রাসূলদের আমানত রক্ষায় তিনি জালিমের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করেননি। কোনো ধরণের হুমকি-ধামকিতে তিনি ভয় পাননি। কারাগারে নির্যাতনের ভয় তাঁকে অস্থির করে তুলতে পারেনি। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও তিনি আদর্শের জয়গান গেয়ে গেছেন। তাগুত আব্দুল নাসেরের বিরুদ্ধে যে আঙ্গুল দিয়ে তিনি সত্যের বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তাগুতের সমর্থনে কিংবা তাগুতের প্রতি

সম্প্রীতি প্রদর্শনে তিনি সে আঙ্গুল ব্যবহৃত হতে দেননি। এই অবস্থাতেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন।

আকীদাহকে জয়ী করার জন্য, আদর্শকে জয়যুক্ত করার জন্য সাইয়্যেদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেছেন। তাঁর কথাগুলো আজ জীবন্ত হয়ে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে, মজবুত দলিল হয়ে আমাদের জন্য আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। রাসূলদের অনুসারী ও উত্তরসূরীদেরকে সাহায্য করার পক্ষে তাঁর দুর্যোগ কবলিত জীবনের ঘটনাগুলো বিশ্বাসীর জন্য হয়ে আছে উত্তম দৃষ্টান্ত, আলোর মিনার ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রমাণপঞ্জি। তাঁর জীবনী আজও বিশ্বাসীর মনে সৃষ্টি করছে রাসূলের অনুসারীদের জন্য প্রশংসার আসন।

উস্তাদ সাইয়্যেদ কুতুবের মতো দ্বীনের অন্যান্য ধারক-বাহকদের কীর্তিগুলো আজও অমর হয়ে আছে যদিও তাঁদের দেহ ও বাহ্যিক আকৃতি এ জগত থেকে বিদায় নিয়ে গেছে এবং তাঁরা সাহায্য ও বিজয় দেখে যেতে পারেননি।

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿غافر: ٥١﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿غافر: ٥٢﴾

অর্থঃ 'নিশ্চয়ই আমি সাহায্য করব রাসূলগণকে ও মু'মিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।সে দিন যালেমদের ওযর-আপত্তি কোনো উপকারে আসবে না, তাদের জন্যে থাকবে অভিশাপ এবং তাদের জন্যে আরও থাকবে নিকৃষ্টতম আবাস।' (সূরা মু'মিন; ৪০: ৫১-৫২)